মাতারানি'র দুয়ারে

শেলী মিত্র

কর্মসূত্রে পিসতুতো দাদা তখন জম্মু-কাশ্মীরে ডোডা জেলার চন্দ্রকোটে থাকে। এক মাসের গরমের ছুটিতে ছেলেকে নিয়ে সেখানে যাওয়ার প্ল্যান বৌদির। জানতে পেরে ওদের সঙ্গে নিজের টিকিটও কেটে নিলাম। তবে এক মাস নয়, আমার বরাদ্দ এক সপ্তাহ। সে যাই হোক, কাশ্মীর ছুঁয়ে আসব— এটাই যথেষ্ট!

দু' রাত আর দেড় দিনের ট্রেন সফর শেষে জম্মু স্টেশনে পৌঁছলাম, বেশ দেরিতেই। দাদা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। দিনের আলোয় পথ চলা শুরু হলেও, গন্তব্যে পৌঁছতে রাত ন'টা বেজে গেল। তিন দিনের মধ্যে অনেক কিছু দেখতে হবে। রাতে হালকা গল্পগুজোব করে খাওয়াদাওয়া সেরে তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পড়ন্ত বেলায় দেখা বাগলিহার জলবিদ্যুত্ প্রকল্প

চন্দ্রভাগা নদীর উপর বাগলিহার জলবিদ্যুত্ প্রকল্পের কাজ তখনও চলছে। প্রথম দিন আশেপাশের কয়েকটা জায়গা ঘোরাঘুরি করে, বিকেলের দিকে দেখতে গেলাম সেই প্রকল্প। প্রায় দশ বছরের ফসল এই প্রকল্প। ১৯৯৯ সালে চন্দ্রভাগা নদীর ওপর বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়। প্রথম দফার কাজ শেষ হয় ২০০৪-এ। ২০০৮-এ

সম্পূর্ণ হয় এই ৪৫০ মেগাওয়াটের প্রজেক্ট।

পর দিন ভোরবেলা ডাল লেকের উদ্দেশে রওনা হলাম। শিকারা-ভ্রমণ সেরে, পাড়ের 'নিশাত বাগ' দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে গেল। শ্রীনগরে শিকারায় ভেসে ভেসেই পর্যটকেরা 'শপিং' করতে পারে। কতকটা ভেনিসের মতো। আমরাও গেলাম সেই সব ভাসমান দোকানে। শাল, সিল্কের শাড়ি, কাশ্মীরি সেলাইয়ের সালোয়ার কামিজের কাপড়, ওখানকার কুটির শিল্পের নানা পসরা নিয়ে সাজানো সেই সব শিকারা। এ সবের মাঝে দিন যে কখন শেষ হয়ে আসছিল খেয়ালই করিনি কেউ। পথে একটি ছোট সুসজ্জিত রেস্তোরাঁতে দুপুরের খাওয়া সেরে ফিরে এলাম চন্দ্রকোটে। মাঝে আর মাত্র একটা দিন। তার পর আমার জম্মু থেকে ফেরার পালা। মাঝের ওই দিনটি কাটরায় থেকে, বিকেলে জম্মু যাওয়ার ইচ্ছে দাদার। পরের দিন আমাকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা করিয়ে ও ফিরে যাবে চন্দ্রকোটে। সেই মতো কাটরার এক হোটেলে ঘর নেওয়া হল। দুপুরের খাওয়া বাইরের একটি রেস্তোরাঁয় সারছি, হঠাত্‌ই চোখ গেল রাস্তার উল্টোদিকে। সার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে, মনে হল টিকিট কাউন্টার। এত ভিড় কোথায় যাওয়ার জন্য? জানতে চাওয়ায় দাদা বলল, বৈষ্ণোদেবী।

কাটরা থেকে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার পায়ে হাঁটা পথ পেরিয়ে এই মন্দির। মা বৈষ্ণোদেবী বা 'মাতারানি'র এই মন্দিরে দর্শনার্থী সংখ্যা তিরুপতি মন্দিরের পরেই। পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া ঘোড়া, ডুলি বা পিঠ্ঠুর ব্যবস্থা আছে। তবে এখন হেলিকপ্টার করেও যাওয়া যায়।

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু মন্দির দর্শন বোধহয় কপালে নেই! বৌদির হালকা গা গরম। তা ছাড়া পর দিন এগারোটার মধ্যে জম্মু পৌঁছতে হবে। কিন্তু কিন্তু করে দাদাকে বললাম একটা ঘোড়া ঠিক করে দিতে। আমি একাই ঘুরে আসি। ওরা তো এক মাসের মধ্যে যে কোনও দিন যেতে পারবে। একা ছাড়তে নারাজ দাদা। বলল,

‘চল , ঘুরেই আসি।’ ছোট্ট অর্কও লাফিয়ে উঠল। সবাই যাবে শুনে অগত্যা বৌদিও উঠে পড়ল।

সময় খুবই কম। ঠিক হল ঘোড়ায় করেই যাওয়া-আসা হবে। সেই মতো তিনটি ঘোড়া করা হল— একটিতে দাদা, আর একটিতে বৌদি আর মাঝেরটাতে অর্ক আর আমি। যত ওপরে উঠছি, অনুভব করছি তাপমাত্রার হেরফের। মে মাসের চড়া গরম ছিল না ঠিকই, কিন্তু কাটরার তুলনায় ওপরটা বেশ ঠান্ডা। পাহাড় কেটে কেটে মসৃণ রাস্তা সোজা চলে গেছে দেবদেউলের দিকে, যাকে এখানে ‘ভবন’ বলা হয়। দর্শনার্থীর ভিড় এখানে চব্বিশ ঘন্টা। তাই পাহাড়ি রাস্তার দু’ধারের দোকান খোলা অহরাত্রি। পুজোর সামগ্রী ছাড়াও, পথ চলার জন্য লাঠি, শীতবস্ত্র, খাবার, সবই পাওয়া যায়। কিছু কিছু জায়গায় ছাউনি করা আছে পথযাত্রীদের বিশ্রামের জন্য।

প্রায় তিন ঘন্টা চলার পরে দূর থেকে দেখতে পেলাম দেবী মন্দিরের সুবিশাল আকৃতি। রাতের আঁধারে বিন্দু বিন্দু আলোয় ঝলমল করছে ‘রানি’র আবাসস্থল। কঠিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তাই ক্যামেরা সঙ্গে থাকলেও ছবি তোলার সুযোগ খুব একটা হয়নি। ভবনের বেশ খানিকটা আগে থেকেই রাস্তার উপরদিকে ঢাকা দেওয়া, পাশে লোহার রেলিং। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫২০০ মিটার উচ্চতার এই জায়গায় বৃষ্টি হয় যখন তখন। দর্শনার্থীদের সুবিধার কথা ভেবেই বোধহয় এই ব্যবস্থা। ঘোড়া আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তারা নির্দিষ্ট স্থানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আরও খানিকটা পথ যাওয়ার পর পৌঁছলাম মূল ভবন চত্বরে। তার এক পাশে চটি-জুতো, ব্যাগ, ক্যামেরা— সব কিছু জমা করার একটি ঘর। সেখান থেকে ‘টোকেন’ নেওয়া হয়ে গেলে পাশের আর একটি খোলা জায়গায় গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে সোজা চলে যেতে হবে পুজোর থালা কিনতে। দোকান থেকেই থালার উপরে সাজিয়ে দেবে মায়ের জন্য লাল ওড়না, নারকেল, প্যাকেটে ভরা নকুলদানা, চিনির দানা, ডাল মেশানো প্রসাদ। ‘সিকিউরিটি চেকিং’ করিয়ে এ বার সারবদ্ধ হয়ে প্রতীক্ষার

পালা। দিনের আলো ফোটার আগে যে দেবারতি হয় তা প্রায় ঘন্টা দুয়েকের। তখন গর্ভগৃহে প্রবেশাধিকার থাকে কেবলমাত্র প্রধান পুরোহিত ও অন্যান্য পূজামণ্ডলির। আমাদের সেই আরতির আগেই দর্শন করতে হবে, না হলে দেরি হয়ে যাবে।

পাহাড়ের ভেতর দিয়েই আমাদের লাইন ধীর গতিতে এগোতে লাগল। মাঝে আরও দু'জায়গায় নিরাপত্তাবাহিনীর সুরক্ষা বলয়। আবার 'চেকিং', তার পর রেহাই। এক জায়গায় এক পূজারি সবার হাত থেকে পুজোর থালা নিয়ে নিলেন। এখান থেকে মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে অন্য এক জায়গা থেকে বিতরণ করা হবে। প্রত্যেক থালার সামগ্রী যেহেতু একই, 'আমার-থালা' 'ওর-থালা'র কোনও সমস্যা নেই। যাই হোক, এক সময় শেষ হল গুহার রাস্তা। পাহাড়ের কোলে এক খণ্ড খোলা চাতালে এসে উপস্থিত হলাম। রাত তখন প্রায় দু'টো। দৈত্যাকৃতি কালো পাহাড়ের দেওয়াল চার ধারে। তারই মাঝে শ্বেতশুভ্র মাতৃমূর্তি— অষ্টভুজা, সিংহবাহিনী, সালঙ্কারা। যথার্থ নাম মাতারানি— রানির বেশে মা। চারপাশে আলো ঝলমল করছে। দেবীমূর্তির পাশে বন্দুকধারী। কপাল ভাল ছিল, তাই সে দিন বিশেষ ভিড় ছিল না। চক্ষু সার্থক করে সবাই দেখলাম স্মিতহাস্য সেই দেবীরূপ। তার পরে আবার ঢুকে যাওয়া পাহাড়ের গহ্বরে। এ বার গর্ভগৃহ দর্শন।

রত্নাকর সাগরের একমাত্র কন্যা ত্রিকূটা। ন'বছর বয়সে সে সমুদ্রপাড়ে বিষ্ণুরূপী রামের আরাধনায় বসে। সীতা উদ্ধারে যাওয়ার পথে শ্রীরাম দেখেন এই ধ্যানমগ্ন জ্যোতির্ময়ীকে। রামচন্দ্রকে তার স্বামী হিসেবে বরণ করার কথা বলে ত্রিকূটা। এ জন্মে তা সম্ভব নয়, তবে কল্কি অবতার হয়ে তাকে বিয়ের আশ্বাস দিলেন রাম। এবং ত্রিকূটার ভক্তিতে খুশি হয়ে তার নতুন নাম দিলেন বৈষ্ণবী (বিষ্ণুর সাধক) বিশেষ এক পাহাড়ের গুহায় গিয়ে ধ্যান করার আদেশ দিলেন। পরবর্তীকালে এই পর্বতই ত্রিকূট পর্বতমালা নামে খ্যাত। এখানেই পাথরের রূপ নিয়ে বৈষ্ণবী চিরধ্যানমগ্না। তিনটি শিলাখণ্ড (পিণ্ডি) দেবীর অংশ হিসেবে পূজিত হয় দৈনন্দিন।

গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে একটি ছোট কাউন্টার থেকে প্রসাদ, নারকেল ও ওড়না সংগ্রহ করা হল। এই মন্দিরে ফুল-মালার ব্যবহার নেই। মন্দির প্রাঙ্গন ঝকঝকে পরিষ্কার।

'ভৈরব ঘাটি' দর্শন না করলে নাকি এই তীর্থ অসম্পূর্ণ। দেবীর গুহা থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে এই মন্দির। কথিত আছে, ভৈরবনাথ নামে এক তান্ত্রিকের শিরচ্ছেদ করার সময় তার মাথাটি এই স্থানে এসে পড়ে। মৃত্যুর আগে মায়ের কৃপায় সে মনুষ্যজীবন থেকে মুক্তি পায়। এবং এই আশীর্বাদ পায় যে ভৈরব ঘাটি দর্শন শেষ হলে এই তীর্থের সমাপন। বিধির অন্যথা না করে আমরাও গেলাম ভৈরব দর্শনে।

তার পর নেমে আসার পালা। হোটেলে ফেরত এসে ঘন্টা দুয়েকের বিশ্রাম নিয়ে তড়িঘড়ি রওনা দিলাম জম্মু স্টেশনের উদ্দেশে। গিয়েছিলাম কাশ্মীর দেখতে। ঘুরে এলাম বৈষ্ণোদেবীর গহ্বর। কথায় বলে 'মা ডাকলে, আসতে তো হবেই'।

মনে রাখার মতো

* হালকা উলের পোশাক ভবনের জন্য, আর কাটরার জন্য নিতে হবে সাধারণ গরম পোশাক।
* এই সময় তাপমাত্রা শূন্যেরও নীচে নেমে 'মাইনাসে' চলে যায়।
* কাটরার তুলনায় ভবনে তাপমাত্রা প্রায় ৫ থেকে ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কম।
* জুলাই-অগস্ট মাসে আপেক্ষিক আদ্রতার পরিমাণ বেশি থাকে।
* শীতকালে বরফ পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। তাই ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে যেতে গেলে প্রচুর গরম পোশাক সঙ্গে নেওয়া জরুরি